অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা

হাতে হাতকড়া পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি চাই না

মোস্তাফা জব্বার

খবরটি এরই মাঝে সবারই জানা হয়ে যাওয়ার কথা। অনলাইনে খবরটি প্রকাশের পাশাপাশি পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। খবরটি হলো : বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় গত ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার প্রেস ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে 'অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ১২'-এর খসড়ার ফলোআপ নিয়ে একটি সভা করেছে। সভায় তথ্য সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন সভাপতিত্ব করেন। ওই দিন উল্লিখিত খসড়া সম্পর্কে মতামত দেওয়ার তারিখ নির্ধারিত থাকার প্রেক্ষিতে সময় উত্তীর্ণ হওয়ার ৪ দিনের মাঝে এই সভার আয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে সভায় খসড়া নীতিমালাটিকে ক্র্যাপ করার ঘোষণা সংশ্লিষ্ট মহলে স্বস্তির বাতাস প্রবাহিত করেছে। সচরাচর কোনো ইস্যুতে এত দ্রুত সরকারের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না। এমনকি এত তাড়াতাড়ি কোনো অ্যাকশনও পাওয়া যায় না। এজন্য বিশেষত তথ্য মন্ত্রণালয়কে এত তাড়াতাড়ি হুঁশ হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তবে স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত, এই কাজটিতে সরকারের গণতান্ত্রিক ও প্রযুক্তিপ্রেমিক ইমেজের বেশ কিছুটা ক্ষতি ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। সচেতন থাকলে এই ক্ষতিটা এড়িয়ে যাওয়া যেত।

২৬ সেপ্টেম্বরের সভায় তথ্য সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও বেবি মওদুদ এমপিসহ স্টেকহোল্ডারদের অনেকেই কথা বলেন। সভায় উপস্থিত থেকে সূচনা বক্তব্যটি অবশ্য আমি পেশ করেছিলাম। সভার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে উল্লিখিত খসড়া নীতিমালার বদলে নিউজ ওয়েব পোর্টাল সহায়ক একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রধান তথ্য অফিসার আমিনুল ইসলাম এই কমিটির চেয়ারম্যান ও পিআইবির ডিজি দুলাল বিশ্বাস সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। আমি অন্তর্ভুক্ত আছি প্রস্তাবিত ১৩ সদস্যের এই কমিটিতে। আশা করি, যাদেরকে নিয়ে কমিটি করা হয়েছে তাদের বাইরের অনেকেই এ বিষয়ে মতামত দিতে পারবেন এবং অংশ নিতে পারবেন।

সভায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বক্তব্যটি তথ্য সচিব পেশ করেন সেটি হচ্ছে, সরকার সামগ্রিক অর্থে ইন্টারনেট বা নির্দিষ্টভাবে ফেসবুক-টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কিংগুলো, বরগসাইটগুলো বা নিউজ মিডিয়ার কোনো কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না। ইন্টারনেটের স্বাধীনতা হরণ করাও সরকারের উদ্দেশ্য নয় বলে তিনি জানান। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে এটি জানান, যে খসড়াটি পেশ করা হয়েছিল সেটি তো চূড়ান্ত দলিল নয়ই বরং তার পুরোটাই বদলে ফেলা যেতে পারে। তিনি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সরকারের উদ্দেশ্যটিও স্পষ্ট করেন। তার মতে, সরকার বিশেষত নিউজ পোর্টালগুলোকে সহায়তা করতে চায়। প্রস্তাবিত নীতিমালায় এমন কিছু ব্যবস্থা করার উপায় খোঁজা হচ্ছে যাতে নিউজ পোর্টালগুলো সরকারি বিজ্ঞাপন, এক্রিডিটেশন কার্ড, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, বিদেশে সরকারি প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্তকরণ ও অন্যান্য সহায়তা পেতে পারে। তিনি দুঃখ করে বলেন, সরকারের কার্যক্রমটির সঠিক খবর সবার কাছে সঠিকভাবে পৌঁছেনি এবং এর ফলে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমরা যতটা জেনেছি, তথ্য সচিব নিজেই নীতিমালার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি খসড়া নীতিমালা প্রকাশের সময় উল্লেখ করেছিলেন এবং ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত সেখান থেকেই হয়েছে।

অন্যদিকে আমি মনে করি, তখন সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কোনোভাবেই তাদের এখন যে উদ্দেশ্যের কথা বলছে সেই উদ্দেশ্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারেনি। বিশেষ করে তারা যে নীতিমালাটির খসড়া জনসমক্ষে প্রকাশ করে তাতে ভুল বোঝাবুঝি তো বটেই একটি ভুল সংকেত পাওয়া গিয়েছিল। যে কথাগুলো তথ্য সচিব ২৬ সেপ্টেম্বরের সভায় বলেছেন সেটি নীতিমালার খসড়া সংক্রান্ত উদ্দেশ্যের বিবৃতিতে বলা যেত। সরকারের ইতিবাচক কাজ যে কিভাবে নেতিবাচক হয়ে উঠতে পারে এটি তেমন আরও একটি দৃষ্টান্ত। অন্য কোনো মন্ত্রণালয় এই অদক্ষতার পরিচয় দিলে তেমন মনে করার কিছু ছিল না, কিন্তু তথ্য মন্ত্রণালয় মিডিয়া নিয়ে এমন গুবলেট পাকাবে সেটি কারও প্রত্যাশিত নয়।

বাতিল হওয়া খসড়া নীতিমালার বিভ্রান্তি

একটু পেছনে ফিরে তাকানো যাক। ২৬ সেপ্টেম্বরের সভার আগে তথ্য মন্ত্রণালয়ের পর থেকে যে অনলাইন গণমাধ্যম পরিচালনা নীতিমালা ২০১২ নামের একটি নীতিমালার খসড়া প্রকাশ করা হয় সেটি নিয়ে এরই মাঝে সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কোনো মহলই সেই নীতিমালাটিকে গ্রহণ করেনি। অনলাইনে তুমুল আলোচনা ছাড়াও ২১ সেপ্টেম্বর বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই নীতিমালার বিরুদ্ধে একটি গণস্বাক্ষরতা কর্মসূচিও পালন করা হয়েছে। প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন এই মানববন্ধনের আয়োজন করে। এটি নিয়ে বেশ কটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে অনলাইন গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো একাধিক সংগঠনও গড়ে তুলেছে। বেশ কটি সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের কথা আমরা শুনেছি।

যদিও ২৬ সেপ্টেম্বরের সভার পর তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত খসড়াটির কোনো মূল্যই নেই, তথাপি এটি একটু পর্যালোচনা করা দরকার যে তাতে ভুল সঙ্কেতটি কি ছিল।

ক. খসড়া নীতিমালায় এটি তৈরি করার উদ্দেশ্য কি সেটি না থাকায় প্রথম সন্দেহ তৈরি হয় যে সরকার ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ফলে শেখ হাসিনার একটি গণতান্ত্রিক ও প্রযুক্তিবান্ধব সরকারের ইমেজে ব্যাপকভাবে চিড় ধরে। এর আরও একটি কারণ ছিল, এতে গণমাধ্যম বলতে কি বোঝানো হয়েছে সেটি বলা ছিল না। ২৬ সেপ্টেম্বরের সভায় যখন স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এই নীতিমালাটি শুধু নিউজ ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক তেমনটি আগে বলা হলে ভুল বোঝার প্রথম সঙ্কেতটি থাকত না। যদি বলা হতো, নিউজ পোর্টালগুলোকে সরকারের সহায়তা করার জন্য নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে, তাহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতো না। বরং অনেকের কাছ থেকে সাধুবাদ পাওয়া যেতে পারতো। অথচ খসড়া নীতিমালাটি প্রশংসার বদলে নিন্দা কুড়িয়েছে।

খ. নীতিমালায় আবেদন ফি, আর্নেস্ট মানি, লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি এসব আরোপ করার কথা বলা হয়েছিল। এসব টাকার অঙ্ক অনেক বড় ছিল। ২ লাখ টাকার আর্নেস্ট মানি বা ৫ লাখ টাকার লাইসেন্স ফি এবং ৫০ হাজার টাকার নবায়ন ফি ছোট নিউজ পোর্টালগুলোর জন্য খুবই বড় রকমের ব্যয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। শুধু ▸

দুই-চারটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এসব অর্থের যোগান দিতে সক্ষম। অন্যদিকে এসব অর্থ খরচ করার বিনিময়ে পোর্টালগুলো সরকারের কাছ থেকে কী ধরনের সহায়তা পাবে, সেটিও নীতিমালায় ছিল না। বিশেষ করে সরকার এই পোর্টালগুলোতে বিজ্ঞাপন কিভাবে দেবে, কী হারে দেবে এবং তাতে পোর্টালগুলোর আয় কেমন হবে তার একটি বর্ণও তাতে ছিল না।

এসব বিধিবিধান দেখে এমন সন্দেহ হতেই পারে, সরকার শত ফুল ফুটতে দিতে চায় না। সরকারের উদ্দেশ্য যে ছোট পুঁজিকে সহায়তা করা নয়, সেটিও এতে প্রকাশিত হয়। কাগজের বা টিভির জগতে যেমন করে পুঁজিবাদের থাবা পড়েছে, তেমন করে এখানেও পুঁজির থাবা পড়বে তেমন সন্দেহ দেখা দেয়। এই সন্দেহ খুব স্বাভাবিক ছিল এজন্য যে, আমরা দেশের পত্রিকাগুলো রাঘব বোয়ালদের হাতে বন্দী হতে দেখেছি। এমনকি যেসব ছোট ছোট উদ্যোক্তা টেলিভিশনের লাইসেন্স পেয়েছিলেন তারাও তাদের সাথে বড় পুঁজির মালিকদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন। অন্যদিকে হাতেগোনা দুইচারটি নিউজ পোর্টাল ছাড়া বাকিগুলো প্রকৃতপক্ষে ছোট ছোট ব্যক্তি উদ্যোগ। ছোট ছোট পুঁজি বা কুটির শিল্পের মতো কর্মকান্ড এটি। অনেকেই বছরের পর বছর স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন বা আয়ের বদলে ব্যয় করে বেড়াচ্ছেন। এসব পোর্টালের কামাই বলতে তেমন কিছুই নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি পরিবারিক কর্মকান্ডের মাঝেও সীমিত হয়ে পড়ছে। অথচ এই মিডিয়াগুলো দেশের বিপুলসংখ্যক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর তথ্যক্ষুধা মেটাচ্ছে। মাত্র চার বছরে ১২ লাখ থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যে প্রায় ৩ কোটিতে পৌঁছেছে, তার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এসব নিউজ পোর্টাল থেকে বাংলায় দেশীয় ও আঞ্চলিক কনটেন্ট তৈরি করা।

অন্যদিকে সরকার কাগজে প্রকাশিত পত্রিকা বা রেডিও-টিভি থেকে কোনো লাইসেন্স ফি, আর্নেস্ট মানি, আবেদন ফি বা নবায়ন ফি আদায় করে না। জেলা প্রশাসকের কাছে একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করা ছাড়া সরকারকে আর কোনো অর্থ দিতে হয় না কোনো পত্রিকাকে।

গ. একটি ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে, এই নীতিমালায় বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশনকে যুক্ত করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সাথে এই সংস্থাটির কী সম্পর্ক সেটি আমি জানি না। বিটিআরসি তরঙ্গ ও ব্যান্ডউইডথ নিয়ে কাজ করে। সেজন্য যারা এসব ব্যবহার করে তাদের সাথে এর সম্পর্ক আছে। মোবাইল অপারেটর, রেডিও, আইএসপি, স্যাটেলাইট চ্যানেল বিটিআরসির নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। কিন্তু মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী, স্যাটেলাইট টিভির দর্শক বা ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কী কারণে বিটিআরসির দিকে তাকাবে, সেটি আমার মাথায় ঢোকে না। অনলাইন গণমাধ্যম মূলত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী। একজন সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যেমন করে ইন্টারনেট সেবাদানকারীর তরঙ্গ ব্যবহার করে নীতিমালার প্রস্তাবিত গণমাধ্যমও তাই করে। ফলে তার সাথে বিটিআরসির কোনো সম্পর্কই নেই।

এই বিধানটি দেখে এটি বোঝা যায়, নীতিমালাটি প্রণেতাদের অজ্ঞতাকেই প্রকাশ করেছে। এই প্রণেতারা সম্ভবত রেডিও-টিভির সাথে অনলাইন গণমাধ্যমকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

ঘ. নীতিমালাটি যারা পাঠ করেছেন তারা অবাক হয়েছেন এটি দেখে, এটি কোনো পেশাদারি দলিল হয়নি। এতে সাংবাদিকদের অধিকারের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত ছিল। এসব গণমাধ্যমের শ্রেণীবিন্যাস, জনপ্রিয়তার মাপকাঠি, পেশাদারি মান, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের যোগ্যতা, আর্থিক সঙ্গতি এসব নানা প্রসঙ্গ অনালোচিত ছিল। এটি সত্যিই ভাবতে কষ্ট হয়, এমন একটি অগোছালো দলিল সরকারিভাবে কেমন করে প্রকাশ করা হয় বা এমন একটি দলিলকে যাচাই বাছাই করার জন্য সরকারের পর থেকে কেমন করে অনুরোধ করা হয়! দেশের স্বাধীনতার ৪২ বছর পর সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় একটি পেশাদারি নীতিমালার খসড়া তৈরি করতে পারে না– সেটি ভাবা যায় না। যাহোক, অতি অল্পতেই তথ্য মন্ত্রণালয়ের বোধোদয় হওয়ার জন্য শুভেচ্ছা রইল।

নীতিমালায় কি থাকতে পারে : যেহেতু এরই মাঝে নিউজ পোর্টালের নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে এবং সরকার নিয়ন্ত্রণের বা কণ্ঠরোধের বদলে সহায়তার কথা বলছে সেহেতু একটি প্রস্তাবিত নীতিমালার খসড়া আলোচিত হতেই পারে। সংশ্লিষ্ট মহল এসব বিষয়ে অনেক আলোচনা করতে পারবে। আশা করি, যাদের জন্য নীতিমালা তারাও এ বিষয়ে সোচ্চার বা সরব হবেন। তারা তাদের মতামত ও পরামর্শ দেবেন এবং নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি তাদের মতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে সেটি নীতিমালায় সন্নিবেশিত করবে।

নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে এই জগতের একজন অধিবাসী হিসেবে একদম প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমার একান্ত ব্যক্তিগত মতামতের কিছু বিষয় এখানে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

প্রথমত খুব স্পষ্ট করে বলা দরকার, আজকের দিনে ইন্টারনেট বা যেকোনো ধরনের গণমাধ্যমকে সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবাও উচিত নয়। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এই নীতিমালা প্রণয়নের নামে বা সরকারের সুবিধা বিতরণ করার নামে সেই প্রচেষ্টা যেন গ্রহণ না করা হয়। নীতিমালাটি কোনোভাবেই যেন সেই দরোজা বা ফাঁক-ফোকর না রাখে।

ক) প্রস্তাবিত নীতিমালাটি বাধ্যতামূলক হতে পারে না। শুধু যারা সরকারের কাছ থেকে সহায়তা নিতে চায়, সরকারের সুবিধা পেতে চায় বা স্বীকৃতি পেতে চায় নীতিমালাটি তাদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। অন্য অর্থে নীতিমালাটি স্বেচ্ছায় আরোপযোগ্য হতে পারে। এই নীতিমালার বাইরেও গণমাধ্যম জন্ম নিতে পারবে, পরিচালিত হতে পারবে এবং সেসব গণমাধ্যম অবৈধ বা বেআইনি বলে গণ্য হবে না। খ) সরকারের সহায়তা পাওয়ার জন্য নিবন্ধন করা হতে পারে এবং প্রাক যোগ্যতার সহজ শর্তাবলি থাকতে পারে। নীতিমালায় এসব বিষয় সুনির্দিষ্ট, সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের সহায়ক হবে। গ) কোনো ধরনের আবেদন ফি, আর্নেস্ট মানি, লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি থাকবে না। ঘ) বিটিআরসির কোনো উল্লেখই থাকবে না– নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা। ঙ) নীতিমালায় নিউজ পোর্টালের সম্পাদক, প্রকাশক, সাংবাদিক ও প্রদায়কদের যোগ্যতার বিবরণ থাকবে। চ) নীতিমালায় এ ধরনের মিডিয়ার শ্রেণীবিন্যাস থাকতে হবে।

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com